কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৭

সূরা কাহাফ (৮৩-১১০)

فَاَرَدْنَاۤ اَنْ یُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۸۱﴾

৮৩. আর তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, অচিরেই আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করব।

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেনঃ যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেনঃ তার মাথার চুলে দুটি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেনঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিং-এর অনুরূপ দুটি চিহ্ন ছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার মাথার দুই দিকে দুটি ক্ষতচিহ্ন ছিল।

তবে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ যুলকারনাইন নবী বা ফিরিশতা ছিলেন না, একজন নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহকে তিনি ভালবেসেছিলেন, আল্লাহও তাকে ভালবেসেছিলেন। আল্লাহর হকের ব্যাপারে অতিশয় সাবধানী ছিলেন, আল্লাহও তার কল্যাণ চেয়েছেন। তাকে তার জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা তার কপালে মারতে মারতে তাকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে আবার জীবিত করলেন, এজন্য তার নাম হল যুলকারনাইন।

যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনুল করীম যা বর্ণনা করেছে, তা এইঃ তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌছেছিলেন- পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে উভয় পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِی الْاَرْضِ وَ اٰتَیْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا ﴿۸۴﴾

৮৪. আমরা তো তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

سَبَب এর প্রকৃত অর্থ দড়ি বা রশি। তবে এই শব্দের ব্যবহার ঐ সমস্ত মাধ্যম ও অসীলার জন্যও হয়, যার সাহায্যে মানুষ তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে। এখানে অর্থ হল, আমি তাকে এমন মাধ্যম ও উপকরণ দান করেছিলাম, যার দ্বারা সে দেশসমূহ জয় করে। শত্রুদের অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেয় এবং অত্যাচারী বাদশাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

فَاَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿۸۵﴾

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল।

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَغۡرِبَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِیۡ عَیۡنٍ حَمِئَۃٍ وَّ وَجَدَ عِنۡدَهَا قَوۡمًا ۬ؕ قُلۡنَا یٰذَا الۡقَرۡنَیۡنِ اِمَّاۤ اَنۡ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنۡ تَتَّخِذَ فِیۡهِمۡ حُسۡنًا ﴿۸۶﴾

৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্ত গমন স্থানে পৌছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমরা বললাম, হে যুল কারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র। এটিই হচ্ছে সূর্যাস্তের সীমানার অর্থ। হাবীব ইবন হাম্মায বলেনঃ আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, যুলকারনাইন কিভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল? তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আকাশের মেঘকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলেন। পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছিলেন। এবং প্রচুর শক্তি-সামর্থ দান করেছিলেন। তারপর আলী বললেনঃ আরও বলব? লোকটি চুপ করলে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও চুপ করে যান। [আল-মুখতারাহ: ৪০৯]

حَمِئَةٍ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। অর্থাৎ তিনি সূর্যকে তার দৃশ্যে মহাসাগরে ডুবতে দেখলেন। আর সাধারণত: যখন কেউ সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তার এটা মনে হবে, অথচ সূর্য কখনও তার কক্ষপথ ত্যাগ করেনি। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত, তা হলো, কুরআন একথা বলেনি যে, সূর্য কালো জলাশয়ে ডুবে। বরং এখানে যুলকারনাইনের অনুভূতিই শুধু ব্যক্তি করা হয়েছে।

قَالَ اَمَّا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ یُرَدُّ اِلٰی رَبِّهٖ فَیُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّکۡرًا ﴿۸۷﴾

৮৭. সে বলল, যে কেউ যুলুম করবে অচিরেই আমরা তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَ اَمَّا مَنۡ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَۨ الۡحُسۡنٰی ۚ وَ سَنَقُوۡلُ لَهٗ مِنۡ اَمۡرِنَا یُسۡرًا ﴿۸۸﴾

৮৮. তবে যে ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমরা নরম কথা বলব।

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿۸۹﴾

৮৯. তারপর সে এক উপায় অবলম্বন করল,

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلٰی قَوۡمٍ لَّمۡ نَجۡعَلۡ لَّهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهَا سِتۡرًا ﴿۹۰﴾

৯০. চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল সেটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমরা সৃষ্টি করিনি;

كَذٰلِکَ ؕ وَ قَدۡ اَحَطۡنَا بِمَا لَدَیۡهِ خُبۡرًا ﴿۹۱﴾

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই, আর তার কাছে যে বৃত্তান্ত ছিল তা আমরা সম্যক অবহিত আছি।

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿۹۲﴾

৯২. তারপর সে আরেক মাধ্যম অবলম্বন করল,

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ بَیۡنَ السَّدَّیۡنِ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا قَوۡمًا ۙ لَّا یَکَادُوۡنَ یَفۡقَهُوۡنَ قَوۡلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা তেমন বুঝতে পারছিল না।

যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, سد তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত।

قَالُوۡا یٰذَاالۡقَرۡنَیۡنِ اِنَّ یَاۡجُوۡجَ وَ مَاۡجُوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَکَ خَرۡجًا عَلٰۤی اَنۡ تَجۡعَلَ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿۹۴﴾

৯৪. তারা বলল, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ তো যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন?

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআনুল করীম স্পষ্টতঃই বলেছেঃ (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) [আস-সাফফাতঃ ৭৭] অর্থাৎ নুহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক বর্ণনা এব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১১]

তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি। সেখানে দাজ্জালের ঘটনা ও তার ধ্বংসের কথা বিস্তারিত বর্ণনার পর বলা হয়েছে, "এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই (হে ঈসা!) আপনি মুসলিমদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান। (সে মতে তিনি তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্যান্য মুসলিমরা নিজ নিজ দূর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য মুসলিমরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। (আল্লাহ দোআ কবুল করবেন) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে।

অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধহাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দো'আ করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়)। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। (তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিস্কার হয়ে যাবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃংখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলিমের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলিই অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।' [মুসলিমঃ ২৯৩৭]

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছেঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবেঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।) [মুসলিমঃ ২৯৩৭]।

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম ‘আলাইহিস সালাম-কে বলবেনঃ আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি বলবেনঃ হে আমার রব! তারা কারা? আল্লাহ বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরান্নব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী । একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ চিন্তা করো না। তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। [মুসলিমঃ ২২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ্ব ও উমরাহ অব্যাহত থাকবে। [বুখারীঃ ১৪৯০]। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ “আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী! আজি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ আমি এ কথা শুনে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয় । [বুখারীঃ ৩৩৪৬, মুসলিমঃ ২৮৮০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবেঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামী কাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। [তিরমিযিঃ ৩১৫৩, ইবনে মাজাহঃ ৪১৯৯, হাকিম মুস্তাদরাকঃ ৪/৪৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১০, ৫১১]।

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ ‘হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে

না। এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মান করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া কুরআনে তারা ছিদ্র পুরোপুরি করতে পারছে না বলা হয়েছে, যা হাদীসের ভাষ্যের বিপরীত নয়।

قَالَ مَا مَكَّنِّىۡ فِيۡهِ رَبِّىۡ خَيۡرٌ فَاَعِيۡنُوۡنِىۡ بِقُوَّةٍ اَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَ بَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا ﴿۹۵﴾

৯৫. সে বলল, আমার রব। আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তা-ই উৎকৃষ্ট। কাজেই তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব

অর্থাৎ আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যে ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন তা এ কাজ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। তবে শারীরিক শ্রম দিয়ে ও নির্মান যন্ত্র তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে।

اٰتُوۡنِىۡ زُبَرَ الۡحَدِيۡدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيۡنَ الصَّدَفَيۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِىۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرًا ﴿۹۶﴾

৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার পাতসমূহ নিয়ে আস, অবশেষে মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অতঃপর যখন সেটা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, তোমরা আমার কাছে গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা ঢেলে দেই এর উপর।

زبر শব্দটি زبرة এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। ইবন আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, এটি যেন ইটের মত ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। الصَّدَفَيۡنِ-দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক। قِطۡرًا অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে এর অর্থ গলিত লোহা অথবা রাঙতা।

فَمَا اسۡطَاعُوۡۤا اَنۡ يَّظۡهَرُوۡهُ وَ مَا اسۡتَطَاعُوۡا لَهٗ نَقۡبًا ﴿۹۷﴾

৯৭. অতঃপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না।

قَالَ هٰذَا رَحۡمَۃٌ مِّنۡ رَّبِّیۡ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّیۡ جَعَلَهٗ دَکَّآءَ ۚ وَ کَانَ وَعۡدُ رَبِّیۡ حَقًّا ﴿۹۸﴾

৯৮. সে বলল, এটা আমার রব-এর অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রব এর প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রব-এর প্রতিশ্রুতি সত্য।

এই প্রাচীর যদিও অত্যন্ত মজবুত করে বানানো হয়েছে; যার উপর চড়ে কিংবা যাতে ছিদ্র করে এদিকে আসা তাদের সম্ভবপর নয়, তবুও আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন এসে যাবে, তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটি বরাবর করে ফেলবেন। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী য়্যা'জূজ-মা'জূজের বের হবার সময় এসে পড়বে; যেমন এ কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। একটি হাদীসে এসেছে, নবী (সাঃ) ঐ প্রাচীরের সামান্য ছিদ্রকে ফিতনার নিকটবর্তী সময় বলে উল্লেখ করেছেন। (বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ২২০৮নং) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তারা প্রতিদিন সেই প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করে আর বাকী অংশ কাল ভাঙ্গব বলে ফেলে রাখে। অতঃপর যখন আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের বের হবার সময় হবে তখন তারা বলবে, ইনশাআল্লাহ বাকী অংশ আগামী কাল ভেঙ্গে ফেলব।

সুতরাং তার পরের দিন তারা বের হতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসলীলা চালাবে এমনকি ভয়ে মানুষ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এরপর তারা আকাশে তীর ছুঁড়তে শুরু করবে যা রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট (পোকা) সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। (আহমাদ ১২/৫১১, তিরমিযী ৩১৫৩নং) সহীহ মুসলিমে নাওয়াস বিন সামআন (রাঃ)-এর হাদীসে আরও পরিষ্কারভাবে এসেছে যে, তারা বের হবে ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবার পর তাঁর বর্তমানে। (ফিতনাহ অধ্যায়) আর এই উক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত লোকেদের ধারণার খন্ডন হয় যারা মনে করে যে, মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী তাতার অথবা তুর্কী ও মুঘল সম্প্রদায়; যাদের মধ্যে চেঙ্গিস খান একজন, অথবা রুশ বা চীনা জাতিই হল য়্যা'জূজ-মা'জূজ; যাদের প্রকাশ ঘটে গেছে। অনেকের মতে য়্যা'জূজ-মা'জূজ হল পাশ্চাত্য জাতি, যারা আজ সারা পৃথিবীর উপর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের জাল বিস্তার করে রেখেছে। এ সমস্ত ধারণা ভুল। কারণ য়্যা'জূজ-মা'জূজের আধিপত্য বলতে রাজনৈতিক আধিপত্য উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের হত্যা ও লুঠতরাজের এ জাতীয় সাময়িক আধিপত্য উদ্দেশ্য, মুসলিমরা যার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর আল্লাহ-প্রেরিত মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সকলেই একই সময়ে মারা যাবে।

وَ تَرَکۡنَا بَعۡضَهُمۡ یَوۡمَئِذٍ یَّمُوۡجُ فِیۡ بَعۡضٍ وَّ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَجَمَعۡنٰهُمۡ جَمۡعًا ﴿۹۹﴾

৯৯. আর সেদিন আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব এ অবস্থায় যে, একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়বে। আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, অতঃপর আমরা তাদের সবাইকে পুরোপুরি একত্রিত করব।

بعضهم এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে- বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তাফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন। যেমন তারা মানুষের সাথে মিশে যমীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কারও কারও মতে, এখানে কিয়ামতের সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কারও কারও মতে, যেদিন বাঁধ নির্মান শেষ হয়েছে সেদিন ইয়াজুজ মাজুজ বাঁধের ভিতরে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

فَجَمَعْنَاهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানুষকে একত্রিত করা হবে।

وَّ عَرَضۡنَا جَهَنَّمَ یَوۡمَئِذٍ لِّلۡکٰفِرِیۡنَ عَرۡضَا ﴿۱۰۰﴾

১০০. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফেরদের কাছে,

الَّذِیۡنَ کَانَتۡ اَعۡیُنُهُمۡ فِیۡ غِطَآءٍ عَنۡ ذِکۡرِیۡ وَ کَانُوۡا لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ سَمۡعًا ﴿۱۰۱﴾

১০১. যাদের চোখ ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

اَفَحَسِبَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنۡ یَّتَّخِذُوۡا عِبَادِیۡ مِنۡ دُوۡنِیۡۤ اَوۡلِیَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡکٰفِرِیۡنَ نُزُلًا ﴿۱۰۲﴾

১০২. যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমরা তো কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফিরিশতা, নেককার লোক এবং সেসব নবীগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহর শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন, উযায়ের ও ঈসা 'আলাইহিস সালাম। কিছুসংখ্যক আরব ফিরিশতাদেরও উপাসনা করত, তাই আয়াতে (الَّذِينَ كَفَرُوا) বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির "আমার বান্দা" অর্থ সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা, এমনকি গরু ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে; তারা কি মনে করে যে, এ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা। অন্য আয়াতে আল্লাহ এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কখনই নয়, ওরা তো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" [সূরা মারইয়াম: ৮২]

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُکُمۡ بِالۡاَخۡسَرِیۡنَ اَعۡمَالًا ﴿۱۰۳﴾

বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জনাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত?

اَلَّذِیۡنَ ضَلَّ سَعۡیُهُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ هُمۡ یَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ یُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا ﴿۱۰۴﴾

১০৪. ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে,

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে । অনুবাদে আমি একটি অর্থ গ্রহণ করেছি । এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, ' যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে । " অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখেরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে । দুনিয়ার জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে । দুনিয়ার সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্য পরিণত করেছে । আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কিসে এবং তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের কখনো নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে, এ কথা কখনো চিন্তা করেনি । তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যার কাজ দুনিয়ার এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হারিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয় ।

اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِیۡمُ لَهُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ وَزۡنًا ﴿۱۰۵﴾

১০৫. তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলী ও তার সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কুফরি করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিস্ফল হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না।

অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা, কুফর ও শির্কের কারণে তাদের আমল নিস্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কেয়ামতের দিন দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেনঃ যদি এর সমর্থন চাও, তবে কুরআনের এই আয়াত পাঠ কর- (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)[বুখারীঃ ৪৭২৯, মুসলিমঃ ৪৬৭৮]

ذٰلِکَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا کَفَرُوۡا وَ اتَّخَذُوۡۤا اٰیٰتِیۡ وَ رُسُلِیۡ هُزُوًا ﴿۱۰۶﴾

১০৬. জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ۙ

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا لَا یَبۡغُوۡنَ عَنۡهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।

জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও কি খারাপ মনে হতে থাকবে? আলোচ্য আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না। অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে। না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না।

قُلۡ لَّوۡ کَانَ الۡبَحۡرُ مِدَادًا لِّکَلِمٰتِ رَبِّیۡ لَنَفِدَ الۡبَحۡرُ قَبۡلَ اَنۡ تَنۡفَدَ کَلِمٰتُ رَبِّیۡ وَ لَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾

১০৯. বলুন, আমার রব-এর কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে— আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও।

যদি সাগরের পানি আল্লাহর কালেমাসমূহ লেখার কালি হয়ে যায়, তবে আল্লাহর কালেমাসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সাগরের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও এর কালি বাড়ানোর জন্য আরও সাগর এর সাথে যুক্ত করা

হয়। অনুরূপ অন্য স্থানেও আল্লাহ বলেছেন। যেমন, “আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরো সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।” [সূরা লুকমান: ২৭]

এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর কালেমাসমূহ কখনও শেষ হবে না। হাদীসে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, কুরাইশ সর্দাররা ইয়াহুদীদের কাছে এসে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু দাও যা আমরা ঐ লোকটাকে প্রশ্ন করতে পারি। তারা বলল, তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। তারা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নাযিল হল, (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) অর্থাৎ আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, ‘রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।” [সূরা আল-ইসরা: ৮৫] এটা শুনে ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, আমাদেরকে তো অনেক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওরাত। আর যাকে তাওরাত দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩১৪০]

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে

এ আয়াতকে দ্বীনের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে, এখানে এমন দু'টি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে যার উপরই সমস্ত দ্বীন নির্ভর করছে। এক, কার ইবাদত করছে দুই, কিভাবে করছে। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে ইখলাসের সাথে। আবার সে ইবাদত হতে হবে নেক আমলের মাধ্যমে। আর নেক আমল হবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে আমল করলেই। মোদ্দাকথা, শির্ক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এ আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

এখানে উল্লেখিত শির্ক শব্দ দ্বারা যাবতীয় শির্কই বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো শির্ক হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট তাই তা থেকে বাঁচা খুব সহজ। এর বিপরীতে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো খুব সুক্ষ্ম বা গোপন। এ সমস্ত গোপন শির্কের উদাহরণের মধ্যে আছে, সামান্য রিয়া তথা সামান্য লোক দেখানো মনোবৃত্তি। সারমর্ম এই যে, আয়াতে যাবতীয় শির্ক হতে তবে বিশেষ করে রিয়াকারীর গোপন শির্ক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শির্ক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

মাহমুদ ইবনে লবীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেনঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেনঃ রিয়া। [আহমাদঃ ৫/৪২৮, ৪২৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, “কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেনঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না। কেননা, আল্লাহ শরীকদের শরীকানার সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। [তিরমিযীঃ ৩১৫৪, ইবনে মাজাহঃ ৪২০৩, আহমাদঃ ৪/৪৬৬, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানঃ ৬৮১৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা। বলেনঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত; সে আমলকে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল। [মুসলিমঃ ২৯৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আহমাদঃ ২/১৬২, ১৯৫, ২১২, ২২৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, “পিপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শির্ক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে।” তিনি আরো বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শির্ক ও ছোট শির্ক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দো’আ পাঠ করোঃ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ) [মুসনাদে আবু ইয়ালাঃ ১/৬০, ৬১ নং ৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ১০/২২৪]

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট

ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষাঃ

মহান আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয়ই আমি তাকে জমিনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং সকল বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।" [সূরা কাহফ(১৮): ৮৪]

ইবনে কাসির (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তাঁকে সুবিশাল ক্ষমতা এবং একজন রাজার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিয়েছিলেন। সুতরাং পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমস্ত রাজ্য, তাদের রাজাগণ এবং সমস্ত জাতির লোকেরা তাঁর অধীনস্থ হয়ে যায়। এই আয়াতের 'সাবাব' শব্দের বাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এর অর্থ হল-'জ্ঞান'। অর্থাৎ যুল কারনাইনকে বিপুল পরিমাণ জ্ঞানও আল্লাহ দান করেছিলেন। এত বিশাল ক্ষমতা ছিল মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একটি পরীক্ষা।

মুসলিম শাসকদের করণীয়ঃ

কিন্তু এই বিশাল ক্ষমতা তাঁকে তাঁর করণীয় থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মহান আল্লাহ বলেন-"... ... আমি বলেছিলাম-"হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সাথে দয়ার আচরণ করতে পারো"।" [সূরা কাহফ(১৮): ৮৬]

এটি ছিল মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য আরেক পরীক্ষা। তিনি বিজিত সাম্রাজ্যে আতঙ্ক বিস্তার করেন নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন তা যাচাই করা ছিলো আল্লাহর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পরীক্ষায়ও যুল কারনাইন সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। ফাসিক রাজাদের মত তিনি প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ না নিয়ে বলেন-

"যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে এবং তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি আমি ব্যবহারে নম্র কথা বলবো।" [সূরা কাহফ(১৮): ৮৭-৮৮]

ক্বাতাদাহ (র) বলেন, এখানে সীমালঙ্ঘন (যুলম) বলতে কুফর এবং শির্ক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা কুফর এবং শির্কের উপর অটল থাকবে একজন মুসলিম শাসক তাদের জন্য শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করবেন। তবে এ থেকে বলা যাবে না যে, অমুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে হবে কিংবা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু মুসলিম ভূমিতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাফির-মুশরিকদের জন্য শাসক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। এখানে হয়তো সেটাই বোঝান হয়েছে। আল্লাহু আ'লাম। একইভাবে, কেউ যদি ঈমান গ্রহণ করে এবং সৎ আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে তবে তাকে আর শাস্তি দেওয়া যাবে না।

যুল কারনাইনের প্রজ্ঞাঃ

আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় হলো যে- যুল কারনাইন যখন শাস্তির কথা বলেছেন তখন প্রথমে নিজের দেওয়া শাস্তির উল্লেখ করেছেন আর যখন পুরস্কারের কথা বলেছেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু কেন ? এর কারণ হলো, মুমিনদের জন্য সবচেয়ে আকাঙ্খিত আর মুখ্য বিষয় হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া প্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত। কিন্তু দুনিয়াবী প্রাপ্তি মুমিনের জন্য মুখ্য বিষয় নয়। আবার কাফির মুশরিকরা যেহেতু পরকালে বিশ্বাসই করে না তাই দুনিয়াবী শাস্তিকেই তারা বেশি ভয় করে, পরকালের শাস্তির

ভয়ে তাদের বিশ্বাস নেই। এজন্য ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি প্রথমে আল্লাহর পুরষ্কারের কথা এবং কাফিরদেরকে ভয় দেখানোর জন্য প্রথমে নিজের দেওয়া শাস্তির কথা বলেছেন।

কারাগার নির্মাণের বৈধতাঃ

মহান আল্লাহর বাণী-“তারা বলল, “হে যুল কারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে বিনিময়ে কিছু দেবো যেন আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর গড়ে দেন?”।” [সূরা কাহফ(১৮): ৯৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু বাকর (রা) এর সময় কোন কারাগার ছিল না। উমার (রা) এর খিলাফতকালে প্রথম কারাগার নির্মিত হয়। এই আয়াত থেকে কারাগার নির্মাণের বিষয়টি সাহাবীগণ ইজতিহাদ করেছিলেন। এছাড়াও এখান থেকে অপরাধী ব্যক্তিদেরকে আটক রাখা এবং তাদেরকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখার বিষয়টিও শিক্ষা পাওয়া যায়।

অধীনস্থদের দেখভাল করা মুসলিম শাসকদের অবশ্য কর্তব্যঃ

ইয়াজুজ মাজুজ থেকে জনপদের লোকেরা আশ্রয় চাওয়ায় যুল কারনাইন বলেছিলেন- “আমার প্রতিপালক আমাকে এই বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিবো।” [সূরা কাহফ(১৮): ৯৫]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়-

- রাজ্যের অধীনস্থ লোকদের জান, মাল ও অধিকার রক্ষা এবং ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা একজন শাসকের জন্য বাধ্যতামূলক, এমনকি তার নিজের সম্পদ ব্যয় করে হলেও।
- এই কাজে শাসককে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে-
  - কিছু লোককে অন্য লোকের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। প্রত্যেককে সমান চোখে দেখতে হবে।
  - সবচেয়ে অভাবী লোকটা থেকে সাহায্য বিতরণ শুরু করতে হবে, এরপর ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত কম অভাবীদের দিতে হবে।
  - প্রত্যেক অভাবীকে তার চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।
- সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া বৈধভাবেও কারও অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। একান্ত প্রয়োজনে নিতে হলেও তা কল্যাণমূলক কাজে খরচ করতে হবে।

কিয়ামাতের একটি বড় নিদর্শনঃ

ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন কিয়ামাতের একটি বড় নিদর্শন। যুল কারনাইন বলেছিলেন- “... ... যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি সেটিকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।” [সূরা কাহফ১৮: ৯৮]

এ থেকে জানা যায়, কিয়ামাতের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজের দেওয়াল আল্লাহ ভেঙ্গে দিবেন এবং তারা জমিনে পুনরায় ছড়িয়ে পড়বে। হাদিস থেকেও কিয়ামাতের লক্ষণ হিসেবে ইয়াজুজ-মাজুজের আগমনের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।